পঞ্চম অধ্যায়

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে চরিত্র চিত্রণ

নাটকের চরিত্র সাধারণত বাস্তব মানুষের জীবন অবলম্বন করেই রূপায়িত হয়ে থাকে। তবে যুগমাফিক মানুষের সামাজিক রূপ ও অবস্থান, ক্রিয়া, আচরণ ও আদর্শ প্রভৃতি পরিবর্তিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় থিয়েটার প্রচলনের শুরুতে মাইথলজিক্যাল বা পৌরাণিক নাটকের চর্চা শুরু হয়। ক্রমে শুরু হয়েছিল দেশপ্রেমিক হিস্টোরিক্যাল বা ঐতিহাসিক নাট্যচর্চা। সে কারণে এ দুই জেলায় প্রথম পর্বে রচিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক মৌলিক নাটকগুলি, যা প্রকাশিত মঞ্চায়িত ও পাণ্ডুলিপি আকারে সংগৃহীত হয়েছে, সেই সব নাটকে রূপায়িত চরিত্রের অন্তর্জীবনের বাস্তব রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আবার এতদ্‌ঞ্চলের স্বাধীনোত্তর পর্বের বেশ কিছু সামাজিক নাটকে মফস্বল কেন্দ্রিক সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের নানারকম মানুষ স্থানলাভ করে তাদের জীবনের সজীব রূপ ব্যক্ত হয়েছে। তাই জেলাদ্বয়ের সামাজিক নাটকে চিত্রায়িত এই সব চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে তাদের ভাব ও আচরণ গভীর আঘাতের জীবনের কোন মৌলিক সত্য ফুটে তুলতে না পারলেও অনেক জটিল চিন্তা ও জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। শুধুমাত্র হৃদয়াবেগের সংঘাতের চেয়ে বরং আর্থ-সামাজিক সমস্যার আঘাতে চরিত্র গুলির রূপ বেশ জটিল, অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক। বাস্তব জীবনধর্মী ও মননধর্মী হয়ে উঠেছে। আলোচ্য অধ্যায়ে জেলার (উত্তর ও দক্ষিণ) নাটকগুলিতে উপস্থাপিত চরিত্রগুলির বাস্তবসম্মত রূপায়ণ তুলে ধরছি।

দিনাজপুর জেলায় (উত্তর ও দক্ষিণ) রচিত নাটকগুলির চরিত্র চিত্রণ পর্ব:

পৌরাণিক চরিত্র:

রাবণ :

নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর তাঁর রচিত 'স্বর্ণলঙ্কা' নাটকে প্রচলিত ধ্যানধারণাকে উপেক্ষা করে রাবণ চরিত্রটিকে এক অসাধারণ চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন, যা তাঁর প্রতিবাদী অনন্যকীর্তির নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

'স্বর্ণলঙ্কা' নাটকে লঙ্কাধিপতি রাবণ চরিত্রটির প্রধান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। স্বর্ণলঙ্কার সাগর তটে সন্ধ্যাবন্দনায় ধ্যানমগ্ন রাবণ মধ্যে আছে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস। সে যুগ যুগ ধরে প্রতি সন্ধ্যায় অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রভুর স্মরণ করে চলে। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ ভক্তি ভালোবাসা তারমধ্যে দেখা যায়। রাবণ প্রভুর দর্শনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে। প্রভুর প্রতি রাবণের ভক্তি এতটাই গাঢ় ছিল যে প্রভুর নির্দেশ মতো রাবণ প্রভুর অপ্রিয় কাজে কর্মরত—

''কি কহিলে? শত্রুরূপে পাব তোমা?
ভুলি নাই ভুলি নাই প্রভু!
ছায়া মম আছে স্মৃতিপটে—
ঐ সূত্র লক্ষ করি,
চালিত করেছি মোর জীবনের ধারা।
বিবেকেরে রুদ্ধ করি কঠিন পেষণে
সাধিতেছি কার্য্য যত অপ্রিয় তোমার।''

সে প্রভু রামচন্দ্রকে শত্রুরূপে পাবে ও প্রভুকে নিপীড়ণ করতে হবে শুনে রাবণ বলেছিল—

''না, না, প্রভু পারিব না—পারিব না তাহা।
নিশিদিন দ্বন্দ্ব করি বিবেকের সনে
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন আমি—
কোন্ প্রাণে নির্য্যাতন করিব তোমারে?''

কিন্তু প্রভুর প্রতি রাবণের ভক্তি এতটাই গাঢ় ছিল যে শেষ পর্যন্ত প্রভুর নির্দেশ মতোই রাবণ তার প্রভুর অপ্রিয় কাজ করবে স্থির করেন। তাই পঞ্চবটী বনে গোদাবরী তীরে অপমানিত হয়ে সূপর্ণখার মুখে রামচন্দ্রের নাম শুনে রাবণ মনে করে যে সূপর্ণখার মুখ দিয়ে রামচন্দ্র তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অন্তরে স্থির বিশ্বাসের উপনীত হয়ে বলে ওঠেন—

''মানব দেবতা মোর—
(প্রকাশ্য) রামচন্দ্র আসিয়াছে নিজে?
সত্য এ সংবাদ! কর নাই ভুল?

এরপর স্বাভাবিক ভাবেই বোন সূপর্ণখার কথা শুনে রাবণ উত্তেজিত হলেও অন্তর থেকে তিনি প্রভু রামচন্দ্রের আদেশ অনুযায়ী কর্ম সমার্পণ করে চলেছেন। যেহেতু শত্রু রূপে ভগবান লাভ করবেন জন্য সে মাফিক অপ্রিয়কাজে রত হয়ে সীতাদেবীকে পঞ্চবটী বনের পর্ণশালা থেকে মায়াবী রাক্ষস মারীচকে সঙ্গে নিয়ে হরণ করা উদ্যোগ গ্রহণ করলে মারীচ রাবণকে বলেছেন যে, জানকীকে হরণ করলে তুমি সবংশে মজিবে এবং স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হবে। মারীচের রাবণ ভীষণ যুক্তিসঙ্গত উত্তর প্রদান করে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন—

''পাপ কার্য্য! পাপ কার্য্য!
শত্রুভাবে— ওরে মুর্খ,
শত্রুভাবে তাহারে লভিতে হয়।

কেবা জানে— জরাগ্রস্থ হ'য়ে
কতদিন বাঁচিয়া রহিবে ভবে?
মৃত্যু অন্তে পাবে কি পাবে না তায়?
মুক্তি যদি কাম্যতব?
সত্য যদি ভগবান তোমার শ্রীরাম,
লভ মৃত্যু শ্রীহস্তে তাঁহার।"

রাবণের এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁর অসাধারণ প্রভুভক্তি, নিষ্ঠাসহ দায়িত্ব পালনের একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। এরপর রাবণ সীতাদেবীকে স্বর্ণলঙ্কার বিলাস কক্ষে নিয়ে এসে সীতা দেবীকে আতিথ্য করার জন্য রাজকীয় আয়েজন উপেক্ষা করে ভক্তি ভরে, পবিত্রভাবে ও শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে তিনি রাজসভার উদ্দেশ্যে আদেশ করে বলেছেন—

"নহে এই গান— নহে এই গান,
ধরণীর শ্রেষ্ঠা নারী অতিথি লঙ্কায়,
শ্রেষ্ঠ উপচারে তাঁরে পূজিতে হইবে।"

তাঁর এই উক্তির মধ্য দিয়ে দানবীয় ঔদ্ধত্যের চেয়ে সাধারণ ভক্তিরসে শান্ত মানবীয় মূর্তি উন্মোচিত হয়েছে, যা রামায়ণ মহাকাব্যের বর্ণিত রাবণ চরিত্রের চিরন্তন মূর্তির বিপরীত ধারণা আমাদের মধ্যে নতুন ভাবনায় উন্নীত করে তোলে।

এরপর অনুজ বিভীষণ দাদা রাবণকে বলেছেন তুমি জানকী রূপবহ্নি মাঝে ঝাপ দিয়ে মোহবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অপরদিকে স্ত্রী মন্দোদরী জানকীকে লঙ্কায় হরণ করে নিয়ে আসার ঘটনায় স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, আমি সীতার ক্রন্দন সহ্য করতে পারছি না। তুমি তাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দাও। তবুও রাবণ তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। এমতাবস্থায় ঘটনাক্রমে রামের সঙ্গে তার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এবং নাটকের শেষ পরিণতিতে দেখা যায় শ্রীরামচন্দ্রের মৃত্যু বাণে আহত রাবণ তাঁর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে ভক্তি ভরে অন্তরের নিহিত প্রার্থনা ব্যক্ত করে বলেছেন—

"কত ভালবাস প্রভু অধম সন্তানে!
সহি' গর্ভবাস— সহি' লক্ষ্মীর বিরহ,
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠ-ধাম আনন্দ আলয়,
মরতে এসেছ নাথ মুক্তি দিতে মোরে!
মোর সম ভাগ্যবান কেবা?

কিন্তু— বড়ই কঠিন নাথ,

শত্রুভাবে সেবা!"

পরিশেষে রাবণ চরিত্রটির ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটলেও উক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রাবণ চরিত্রটি ট্র্যাজিক পরিণত বহ চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ তাঁর এই বিষাদময় ও করুণ পরিণতি সে যেন আগে থেকেই জ্ঞাত। তা সত্ত্বেও একথা সর্বৈব সত্য যে সকল জীবাত্মার মধ্যে পারমার্থিক লাভের যে সুপ্ত বাসনা তা রাবণের মতো চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর অভাবনীয়ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সীতা:

'স্বর্ণ-লঙ্কা' নাটকের রামপত্নী সীতা চরিত্রটি একটি প্রধান নারী চরিত্র। সে রাজপ্রসাদের স্বর্গ সুখ ত্যাগ করে, স্বর্ণ অলংকার, বসন, ভূষণ ত্যাগ করে বল্কল বাসে সজ্জিত হয়ে স্বামীর সঙ্গে বনবাসে যায় এবং বনবাসে স্বামীর সঙ্গে থাকতে পেরে বনবাস তার কাছে কষ্টের না হয়ে স্বর্গবাসে পরিণত হয়। সীতার উক্তির মধ্যে তা প্রকাশ পায়।

"... ... ...

নিশিদিন তোমারে পাইব

কল্পনায় আনি নাই মনে ...

কভু ভাবি নাই, জননীর অভিশাপে

বনবাস স্বর্গবাসে হবে পরিণত!"

রাবণ ছলনার আশ্রয় নিয়ে সীতাদেবীকে অপহরণ করতে এলে সীতা বলে স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের স্পর্শে এলে সে অপবিত্র হবে কলঙ্কিত হবে তাই রাবণ যেন তাকে না স্পর্শ করে—

"না, না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না মোরে,

অপবিত্র স্পর্শে তব

কলঙ্কিত করিয়ো না শরীর আমার—

স্ব-ইচ্ছায় যাইতেছি আমি।"

সীতাদেবীর যে অন্তরে পতিপ্রেম, শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালোবাসা এবং সনাতন নারীসত্তার যে ঐতিহ্য তা মূর্ত হয়ে উঠেছে এই চরিত্রে তাই দেবী সীতা স্বর্ণলঙ্কার অধিশ্বর রাবণের কোন রকম প্রস্তাবে সাড়া না (তার পূজা, তাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা) দিয়ে এরকম প্রতিবাদী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন—

"যদি লক্ষ জন্ম রাম-সনে

না হয় মিলন
তবু পরপুরুষের পূজা
কভু না লইবে সীতা।
তার চেয়ে কর অত্যাচার
সব অকাতরে,
অর্ঘ্য তব লইতে নারিব।”

লক্ষ অত্যাচার সহ্য করেও স্বামীর প্রতি বিশ্বাস রেখে সীতা রামের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে।

সীতার অন্তরে ছিল স্নেহ বাৎসল্য, সরমার কাছে যুদ্ধে তার পুত্রর মৃত্যু সংবাদ শুনে সীতা বলে—

‘‘কোন্ প্রাণে, ওরে হতভাগী,
একমাত্র পুত্র-নয়নের নিধি—
কোন্ প্রাণে কহ তারে
পাঠাইলে রণে?”

স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছু পরিহার করে তার হৃদয়ে স্বামী রামচন্দ্রের বিরহ ব্যথা তাকে সর্বদা ভীষণ ভাবে ব্যথিত ও উন্মুখ করে রেখেছে, তাই সে চরম ভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ও এরূপ যন্ত্রণা দায়ক পরিস্থিতিতে বড়ই ক্লান্ত ও কাতর হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে নিস্পেষিত হয়ে তার কাছে মৃত্যুই শতগুণে শ্রেয় হয়েছে।

‘‘তাই কর-তাই কর—
বধ মোরে রক্ষরাজ!
মৃত্যু শ্রেয় শতগুণে
রাঘব বিরহ হ’তে।
দাও মোরে মৃত্যু দাও—”

বসুদেব:

বসুদেব চরিত্রটি ‘কারাগার’ নাটকে নানা দিক থেকেই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বসুদেব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা। রাজা উগ্রসেন বসুদেবের পিতার হাত থেকে মথুরার সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ঠিক তার পরেই রাজা উগ্রসেন যখন কংসের অহংকার দেখে চিন্তিত হয়ে সেই সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন জামাতা বসুদেবকে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ থেকে যেন তাঁর আত্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আত্মবিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে বসুদেব বলেছেন—

''দান গ্রহণে নয়, স্বকীয় সাধনায় পুনরুদ্ধার করবে।'' যথেষ্ট আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ও ব্যক্তিত্ববান বলেই তিনি জানিছিলেন— ''আমি জানি, দান গ্রহণে কখনো স্বধিকার প্রতিষ্ঠা হয়না। আমরা রাজ্যচ্যুত, অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, কিন্তু ভিক্ষুক নই। ... আমরা শক্তিসাধনা করছি। ... সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ঐ রাজদণ্ড, ঐ রাজমুকুট অর্জন করব... ভিক্ষা করে নয়, দান গ্রহণেও নয়।''

দেশপ্রেমের পটভূমিতে চরিত্রটি যেন আলাদা মাত্রা পেয়েছে। তিনি দুর্বলতা ও ভীরুতাকে ঘৃণা করতেন। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ সার্থক রক্ষাকর্তা। বসুদেব কখনোই নিজ মর্যাদাবোধকে ভুলে যাননি। যাদবগণ অত্যাচারিত ও উপীড়িত হয়ে বসুদেবের কাছেই ফিরে আসত সমাধানের জন্য। তিনি তার নিজের যাদবগণের এই হীনমন্যতা, কাপুরুষতা দেখে ব্যথিত হতেন। বসুদেব বলেছেন— খাপের ভিতর ভরে রাখ, বাইরে ঠাণ্ডা হওয়ায় ওদের (অস্ত্রগুলি) অসুখ করতে পারে। তিনি এও জানিয়েছেন— ''এখন এ ক্রন্দন বৃথা! যেদিন উগ্রসেন পিতার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিতে এসেছিল, সেদিন তোমরা কোন প্রতিবাদ করনি, বরং ঘরভেদী বিভীষণের মতো তোমরাই হয়েছিলে তার সহায়, তার সৈন্য!... নিজ হাতে যে বীজবৃক্ষ রোপন করেছে, তার ফলভোগ... বংশানুক্রমে করবে... এ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে জন্মে জন্মে।'' দাসত্বকে বসুদেব কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। এই নাটকের অন্তরালে দেশ প্রেমের বাণী সেন ধরণীত হয়েছে প্রতিটি অন্ত্রে অন্ত্রে। বসুদেব কংসের রাজকর্মচারী বিদূরথকে বলেছেন— ''আমাদের অস্ত্র আমাদের দেবতার হাতে তুলে দিয়েছি... নিরস্ত্রের উপর সশস্ত্রের অত্যাচারের ঐ পাষাণই তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। হাসিমুখে আনন্দ উল্লাসে তোমার অস্ত্রাঘাত সহ্য করব।''

বসুদেব প্রতিশ্রতি বসুদেব নিঃশব্দে পালন করেছেন। তিনি এক বসুদেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কংসকে তার সন্তান জন্মাবার পরেই তাকে তুলে দেবেন এই পাষাণের হাতে। ''তখন জানরতাম না পুত্র কি! তখন জানতাম না যে, পুত্র ইহলোকের আশা, পরলোকের ভরসা, তখন শুধু তোমার প্রেমমুগ্ধ মুখখানিই ছিল আমার স্বপ্ন, আমার ধ্যান, আমার প্রার্থনা।'' কিন্তু তার অন্তরে ছিল সন্তানহারা পিতার হাহাকার। এই নাট্যদৃশ্যে বসুদেব চরিত্রটির সংযত, শান্ত ও স্থিতিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের সন্তানকে অত্যাচারী কংসের হাতে তুলে দেওয়া এবং অত্যাচারী কংসও তাকে বধ করবে। এই ঘটনা সে কতটা বেদনাদায়ক তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এছাড়াও তিনি কংসকে দেবকীর আড়ালের সুযোগে নিজ সন্তানকে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

মনুষ্যবোধ যেন তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে বসুদেবের চরিত্রে, 'কারাগার' নাটকে নীচতার প্রতি তীব্র ঘৃণা উচ্চারিত হয়েছে অসংখ্যবার। যাদবরা যখন চন্দনাকে কংসের প্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছে, যখন তাকে ইঁটের আঘাতে রক্তাক্ত করেছে, তখন বসুদেব চন্দনার পাশে দাঁড়িয়েছেন।

তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন— ''ওরে ভীরু, ওরে কাপুরুষ, ওরে লুপ্ত মানুষ্যত্বের পিশাচ-প্রেত, জননীর নারী ধর্ম বিনিময়েও রক্ষা করবি এই ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র প্রাণ।''

চন্দনাকে সমাজ থেকে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা যখন প্রবল তখন বসুদেব বলেছেন— ''আমি বেঁচে থাকতে নয়।'' তিনি যাদবদের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন— ''তোমাদের সম্মুখেই ধরতে এসেছিল ... তোমাদের সম্মুখ থেকেই ধরে নিয়ে গেল... তোমরা ভয়ে কেউ কথাটি বলবে না... আজ জাতি নাশ হল— ওর?'' এই মেরুদণ্ডহীন যাদবদের আরো তিরস্কার করে বলেছেন— ''তোমাদের পিঠে তারা পাদুকা প্রহার করেছে, সেই পাদুকায় আবার তখনি তাদের আদেশে তোমরা লেহন করতে বাধ্য হয়েছে? স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী দানব কি শুধু নারীকেই ধর্ষণ করেছে।''

প্রতিশ্রুতি ও পিতার স্নেহ এই দুই এর মাঝে যেন তিনি আহত হয়েছেন। রাজকর্মচারী বিদুরথ এসেছেন কীর্তিমানকে হত্যা করতে। বসুদেব উত্তেজিত ও অসহায়ভাবে ঘোষণা করলেন— ''আমার শির নাও— দেবকীর শির নাও— ঐ শিশুর শির নাও— আমাদের সবার শির একসঙ্গে নাও, আমাদের রক্ষা কর আমাদের বাঁচাও।'' তিনি অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করে কীর্তিমানকে বিদূরথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। জমাট বাঁধা অশ্রু বুকে চেপে রেখে তিনি ছয় ছয়টি সন্তানকে হিংস্র ঘাতকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই বিশেষ নাট্যদৃশ্যে তার সংযত, স্তব্ধতা ও শান্ত চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

জীবনের অশেষ দুঃখ ও পরীক্ষার সম্মুখ হয়েছেন কীর্তিমানকে বিদূরথের হাতে তুলে দেবার মুহূর্তে। অশ্রু বুকে চেপে রেখে সান্ত্বনা দিয়েছেন দেবকীকে, আত্মত্যাগ ও সত্য রক্ষার এই দুই এর মধ্যে বসুদেব ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। দেবতাকে আহ্বান জানিয়েছেন— ''অনাগত দেবতা স্বাগতম।''

'কারাগার' নাটকে যেন প্রকাশ পেয়েছে বসুদেবের সার্থক ভূমিকা। বসুদেব সফল হয়েছেন ভগবানকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামিয়ে আনতে। তিনি জানিয়েছেন— ''আজ ভগবান স্বয়ং স্বর্গ থেকে ধরা তলে নেমে এসেছেন।'' ... ''সশস্ত্র যখন সশস্ত্রের উপর অত্যাচার করে ভগবান তখন জাগেন না; ভগবান জাগেন তখন, যখন সশস্ত্র নিরস্ত্রের উপর অত্যাচার করে।''

কংস:

'কারাগার' নাটকটিতে দানবতা ও মানবতা এই দুই বৈশিষ্ট্য কংস চরিত্রটি যেন অতীব গুরুত্ব লাভ করেছে। কংস পৌরাণিক চরিত্র। পুরাণে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী দানবের আখ্যা নিয়ে। কিন্তু বিশিষ্ট নাট্যকার মন্মথ রায় কংস চরিত্রটিকে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত করে নতুন রূপদান করে দর্শকবৃন্দের মনে সহানুভূতি ও করুণার সৃষ্টি করেছেন।

কংস ছিলেন মথুরার রাজা উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। নাটকে কংসের মধ্যে দ্বৈত সত্তা প্রকাশ

পেয়েছে। দানব ও মানব উভয়ই— যেন তার মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। জন্মদাতা দ্রুমিল রাক্ষসের প্রকৃতিই অনিবার্যভাবে তার মধ্যে প্রকটিত করেছে। হত্যা ও অত্যাচার করতে তার বিবেকে দ্বিধা হত না। নিজ পিতাকেও তিনি মুক্তি দেননি। সে কাম ও ক্রোধে আসক্ত, হিংস্র, নির্দয় ও হত্যাকারী। ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারারুদ্ধ করে রেখে কংস অতীব পাশবিকতার পরিচয় দিয়েছে। এই নাট্যদৃশ্যে ক্ষণবিদ্যুতের ঝিলিকের মতো মানবিকতাও দেখা দিয়েছিল। কংসের চিত্তে। কিন্তু অস্তিত্বের সংকট তাকে চরম ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল। তার দৈববাণীর কথা মনে পড়ে যায়— ''ভগিনীনন্দন হতে কংসের নিধন।'' দানবিক উল্লাসে তিনি জানিয়েছেন— ''আমি আমার ভগিনীকে ভালোবাসি, ভাগিনেয়কে নয়। ... ভগিনীর চাইতেও আমি বেশী ভালোবাসি আমাকে।''

নিষ্ঠুর প্রকৃতির কংসের জীবনেও প্রেমিকার অনুভব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন— ''আমার প্রাসাদে সব আছে, সব ছিল... শুধু নাই এই অতৃপ্ত ললাটের অগ্নিদাহ দূর করতে পারে এমন একখানি প্রিয় হাতের চন্দন পরশ।'' এই উক্তিটির মাধ্যমে তার মনের হাহাকারকেই প্রকাশ করেছে। তিনি চন্দনাকে প্রকৃত অর্থেই ভালোবাসতেন বলেই চন্দনার উপর কোন অত্যাচার করেননি। প্রিয় মানুষের প্রতি অত্যাচার বা বলপ্রয়োগের কথা প্রকৃত মানুষ কখনই ভাবতে পারে না। তিনি ভালোবাসলেও চন্দ্রনা তাকে ভালোবাসেনি তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন— ''তাহলে তোমার কথায় এই বুঝছি... তোমাকে আমার ভালোবাসলেও আমাকে তোমার ভালোলাগেনি। তাই যদি তোমায় চাই, তোমার কাছে সেটা অত্যাচার বলেই মনে হবে। তুমি তা অত্যাচারই মনে করবে।'' তিনি চন্দনাকে মুক্তির দিলেও তার মধ্যে প্রেমের অনুভব ঘটেছিল— ''যে স্বেচ্ছায় আসে, সে ভালোবেসে আসে, কিন্তু সেভাবে সে আসে না, তাকে আমি ধরে রাখিনে। কিন্তু একথাও সত্য, নরক, জীবনে এই প্রথম দেখলাম যে তৃষ্ণার্তকে দেখে নদী শুকিয়ে যায়, পিপাসায় যখন ছাতি ফেটে যায়, তখন সম্মুখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়— এই উত্তপ্ত ললাট তখন নিদারুণ জ্বালায় চন্দন পরশ চায় ...'

Greek Drama-এর মতোই দৈব শক্তিই যেন কংসের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। দানবিকতা ও মানবিকতা উভয়েই তার হৃদয়কে দংশন করেছিল। তার হৃদয়ের প্রয়োজন ছিল 'চন্দন পরশ'-এর মধুর স্পর্শ। তার ক্ষতবিক্ষত হৃদয় সবসময় হাহাকার করত এটকু ভালবাসার জন্য। কংস চন্দনাকে ভালোবেসে তার পরশে শান্তি খুজেছেন, চন্দনাকে পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন— ''আজ আমি ধন্য! আজ আমি ধন্য! আজ আমি জয়ী, পরম জয়ী। দেবতাকে পরাজিত করে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আজ আমি লাভ করেছি ... সে তুমি।'' কিন্তু অস্তিত্বের সংকট তাকে দানব করে তুলেছিল। দেবতা এই অহংকার সহ্য করেননি। তার পতন হয়েছিল অনিবার্যভাবে। নাটকের শেষ দৃশ্যে তিনি

উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নিজের কৃত কর্মের কথা। যা পৌরাণিক নাটকের ঐতিহ্য। তাই কংস চরিত্রটিকে আমরা ট্রাজিক চরিত্রও বলতে পারি।

কংস তার মানবিক দুর্বলতাকে পরিত্যাগ করতে পারেনি। ভগিনী দেবকীর প্রতি তার বেদনার কথা প্রকাশ পেয়েছে নাটকে। স্বপ্নে কংসের চোখে রভেসে ওঠে তার নিষ্ঠুর কর্মের কথা— তার অত্যাচারের কথা— কারাগারে বসুদেব ও দেবকীর অসহায় অবস্থার কথা— নিজের বৃদ্ধ পিতাকে হত্যার কথা। কংসের মানবিক দুর্বলতার চিত্রটি প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে। তার দুই পত্নীর পিতার আশ্রয়ে চলে যায়। তিনি একা ও বিস্তব্ধ হয়ে পড়েন। এতে যেন কংসের ভিতরকার মানবিক চিত্ত কেদে উঠেছিল। নরক বলেছেন— ''সাময়িক দৌর্বলের কথা আপনি জানেন, এবং জানেন বলেই আপনার আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে।'' এর প্রতিবাদ করে কংস জানিয়েছিল— ''মিথ্যা-মিথ্যা অথবা তোমরা ভুল দেখছ, ভুল বুঝেছ। আমি দুর্বল মিথ্যা কথা। মুহূর্তের তরেও আমি এতটুকু দুর্বল নই। আমি নির্মম আমি নিষ্ঠুর। আমি শুধু দুদ্দান্ত দানব নই, আমি দুনির্বার শয়তান।''

কারাগার নাটকে কংসের দানব ও মানব সত্তার সংঘাত হয়েছে সর্বক্ষণ। আমরা দেখেছি সৃষ্টির সেই আদিলগ্ন থেকে যেন মানব সত্তারই জয় হয়েছে। তেমনি আধুনিক নাট্যকার মন্মথ রায়— ''এই নাটকে কংসের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মানবিক উপাদান দিয়ে তাকে জীবন্ত ও নিপুণভাবে দেখিয়েছেন।

ঐতিহাসিক চরিত্র:

রামপাল দেব:

নাট্যকার শিবপ্রসাদ রায়ের কৈবর্ত বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা 'প্রতিষ্ঠা' নাটকটি তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার এক অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে নাটকের শুরুতেই দেখা যায় যে রামপাল দেব সিংহাসনের লোভে দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে বঙ্গভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমিকে অনার্য্যের হাতে তুলে দিয়েছেন— তার জন্য তিনি অনুতপ্ত। ''... যাঁর বিশ্বজয়িনী শক্তি হেলায় শত্রুগণকে পতঙ্গের মতো দলিত করে এসেছে, সেই বঙ্গভূমিকে— সর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমিকে, আমার নির্ব্বুদ্ধিতায়— আমার পরশ্রীকাতরতায়— আমারই অবিমৃষ্য কারিতায় আজ অনার্য্য কৈবত্তের হাতে তুলে দিয়েছি।'' তিনি নিজেকে নরাধম, মহাপাপী বলে দাবি করেছেন। এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন। এই জন্য রামপালদেব মাতৃভূমি উদ্ধার করতে সব কিছু হারিয়ে ও সহায়হীন, সম্বলহীন হয়েও শুধুমাত্র মনের জোরে বৈবর্ত্তদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি তার পুত্র দ্বয় রাজ্যপাল ও কুমারপাল এবং সামন্ত রাজাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করার জন্য আহ্বান জানান। ''... আগামী পূর্ণিমা

তিথিতে সেই উদ্দেশ্য সাধন কল্পে সামন্তরাজগণকে আহ্বান করে এক সভার অধিবেশন হবে, তাঁদের সানুগ্রহ উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।" একদিকে যেমন রামপাল দেবের মধ্যে দেশপ্রেম দেখা যায় তেমনি অন্যদিকে পুত্রদের ফিরতে দেরি হলে তার মধ্যে পিতৃসুলভ আচরণও দেখা যায়— ''রমা, সত্যই আমি পুত্রদের জন্য অত্যন্ত ভাবিত হয়ে পড়েছি। তাদের ফেরাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাবে কি পথে কোন বিপদ হ'ল? শত্রু কি সন্ধান পেয়ে তাদের হত্যা করল?" আবার কৈবর্ত্ত রাজ ভীমের অনুচর ভূষণ রামপালদেবের স্ত্রী রমাদেবীর হাত ধরলে তাকে উদ্ধারের জন্য রামপালদেব জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নাটকের শেষে দেখা যায় যে রামপাল সৈন্য হীন হয়েও শুধুমাত্র বুদ্ধিবলে শত্রুর গতিরোধ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত পুত্রদের সাহায্যে ভীমকে বন্দি করতে সচেষ্ট হন। রামপালদেব সামন্তরাজাদের সাহায্য নিয়ে হৃদ রাজ্য উদ্ধার করেন এবং সামন্তরাজগণ রামপালদেবকে গৌড়েশ্বর বলে অভিহিত করেন। ''রামপাল একদিকে যেমন পালবংশের প্রতিষ্ঠা করেন অন্যদিকে তেমনি অন্ধজাতি বিদ্বেষ বিসর্জন দিয়ে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস তাঁর চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়— ''... এই মহাপুরুষের আত্মবিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের বিদ্বেষ, মলিনতা, সংকীর্ণতা যা কিছু ছিল সব প্রীতির অশ্রুতে ধুয়ে নির্ম্মল হয়ে যাক। পালবংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যের 'প্রতিষ্ঠা' হোক্।"

প্রতিষ্ঠা নাটকের অন্যতম ঐতিহাসিক চরিত্র রামপাল দেব সিংহাসনের লোভে দ্বিতীয় মহিপালের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে বঙ্গভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমিকে অনার্য্যের হাতে তুলে দিয়েছেন, তার জন্য তিনি অনুতপ্ত। তিনি নিজেকে নরাধাম, মহাপাপী বলে দাবি করেছেন। এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছেন। এই জন্য রামপাল দেব মাতৃভূমি উদ্ধার করতে সবকিছু হারিয়ে ও সহায়হীন, সম্বলহীন হয়েও শুধুমাত্র মনের জোরে কৈবর্ত্তদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি তার পুত্রদ্বয় রাজ্যপাল ও কুমারপাল এবং সামন্ত রাজাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদের সাহায্য নিয়ে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করার জন্য আহ্বান জানান। একদিকে যেমন রামপাল দেবের মধ্যে দেশপ্রেম দেখা যায় তেমনি অন্যদিকে পুত্রদের ফিরতে দেরী হলে তারমধ্যে পিতৃসুলভ আচরণ দেখা যায়। আবার কৈবর্ত্তরাজ ভীমের অনুচর ভূষণ রামপালদেবের স্ত্রী রমাদেবীর হাত ধরলে তাকে উদ্ধারের জন্য রামপাল দেব জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নাটকের শেষে দেখা যায় যে রামপাল সৈন্যহীন হয়েও শুধুমাত্র বুদ্ধিবলে শত্রুর গতি রোধ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত পুত্রদ্বয়ের সাহায্যে ভীমকে বন্দি করতে সচেষ্ট হন। রামপালদেব সামন্ত রাজাদের সাহায্য নিয়ে হৃত রাজ্য উদ্ধার করেন এবং সামন্তরাজ গণ রামপাল

দেবকে গৌড়েশ্বর বলে অভিহিত করেন।

ভীম:

প্রতিষ্ঠা নাটকের কৈবর্ত্তাধিপতি 'ভীম' চরিত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনায়কের ভূমিকায় চিত্রিত হয়েছে। নাটকে ভীম অত্যন্ত সক্রিয়তার সঙ্গে রাজধর্ম পালন করে। বঙ্গ সম্রাট দ্বিতীয় মহীপালদেব কে রাজ্যচ্যুত করে বঙ্গ সম্রাট হন কিন্তু এর জন্য তিনি কোন ছলনার আশ্রয় নেননি, যুদ্ধ করেই সিংহাসনে আরোহন করেন। ভীম বঙ্গসম্রাট হওয়ার পরে রাষ্ট্রকূট রাজ কর প্রদানে অসম্মত হয় এবং কৈবর্ত্তদের অস্পৃশ্য বলে অপমান করলে ভীমের নিজ জাতীয় প্রতি যে শ্রদ্ধা রয়েছে তার প্রকাশ পায় এই উক্তির মধ্যে দিয়ে— ''শুধু অসম্মত নয়, ভূষণকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিয়েছে— আমাদের অস্পৃশ্য ঘৃণ্য কৈবর্ত্ত বলে অভিহিত করেছে। হরি, প্রস্তুত হও এ মর্মান্তিক অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।'' ভীম চরিত্রের মধ্যে-নারীর মান, সম্ভ্রম রক্ষা করতে দেখা যায়। রামপালের স্ত্রীর রমাদেবীর সম্মান ভীমের সৈন্যগণ নষ্ট করেছেন শুনে ভীম অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন, এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তিনি রামপালের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আবার রামপাল পরাজিত বিরুদ্ধ পক্ষ হয়েও তার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেন— ''আসুন রাজা, আসন গ্রহণ করুণ। ভুলি নি রাজা, বন্দীর যোগ্য সম্মান দিয়েছি মাত্র।'' ভীম দক্ষতার সঙ্গে যেমন রাজ্য শাসন করেন তেমনি আবার বীরের মতো রামপাল দেবকে প্রত্যক্ষ সমরে আহ্বান করেন— নাটকের শেষে দেখা যায় রামপালদেবের কাছে যুদ্ধের ভীম পরাজিত হন কিন্তু তিনি আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিতে পারেননি। তাই রামপালদেব মুক্তি দিতে চাইলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং হীরক অঙ্গুরিস্থিত বিষ পান করেন— ''ঠিক করেছি রাজা। আমার গবোন্নত মস্তক একমাত্র ভগবানের কাছে নমিত হয়ে এসেছে, আর পাছে মানবের কাছে নত করতে হয় সেই ভয়ে তারই চরণে আশ্রয় নিতে চল্লম।''

সামাজিক চরিত্র:

দেবাংশী:

দেবাংশী পশ্চিম দিনাজপুরের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীন কিছু প্রথা, সংস্কার এবং লৌকিক দেব-দেবীর (মা বিষহরি) পূজা, পূজার থানকে কেন্দ্র করে অদ্ভুত ধরনের এক অলৌকিক বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। তার মূর্তপ্রতিভূ দেবাংশী। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে মা বিষহরি মায়ের মাহাত্ম্য ভরা দৌহদ্দির মধ্যে খেরা পূজার থানে হঠাৎ এক দশ বছরের বালক ঢুকে পড়ে বেহুশ হয়ে পড়লে তার গুরু বিরাম গুণমান সেই বালকের ভাব লক্ষণ দেখে ঘোষণা করে যে, সারবান লোহার সাধারণ মানুষ নয়, দেবতার অংশ। বিরাম গুণমানের এই কথায় বিশ্বাস করে গ্রামবাসী এই বালকের

মধ্যে দেবত্বের ছায়া দেখতে পেয়ে তাকে দেবতার অংশ বা দেবাংশী বলে বিশ্বাস করে। মোটকথা, সারবান লোহারকে গ্রামীণ সমাজে সকলের লোকবিশ্বাসে দেবতা হয়ে দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিল। গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিত্ত নৈমিত্তিক রোগ-শোক, ব্যাথা-বেদনা, জরা-ব্যথি ও দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হয়ে তার কাছে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিধান প্রার্থনা করে। এমনকি গ্রামের এইসব সাধারণ অসহায় গরীব মানুষদের আন্তরের বিশ্বাস যে, দেবাংশী মুখ দিয়ে (মা বিষহরি দেবীর ভরে) সে কথা বলে তাই দেখা যায় দেবাংশীর মুখের কথাতেই গ্রামবাসী তৃপ্তি লাভ করে। এর ফলস্বরূপ গ্রামের সকল মানুষ এই সদাশান্ত, ও নিয়মনিষ্ঠ দেবাংশীকে দেবতাজ্ঞানে তারা নিয়মনীতি মেনে নিষ্ঠাসহ পূজা করে অন্তরের মুল-দুঃখ থেকে শুরু করে নানা ধরনের চাওয়া পাওয়ার আর্জি জানায় ও নিদান পেয়ে ভক্তি ভরে মেনেগুনে দিন যাপন করে।

কৃষিপ্রধান দিনাজপুর অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে রাস্তাঘাট, যোগাযোগ চিকিৎসা ব্যবস্থার তেমন সুবিধা না থাকায় গ্রামীণ নিঃস্তরঙ্গ জন-জীবনে কোন দেবতার ভর ওঠে বিশেষ করে সারবান লোহারের মতো দেবাংশীদের কাছেই তারা দৈনন্দিন সুবিধা ও অসুবিধাগুলির সমাধানের পথ খোঁজে। এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে অর্থবান মানুষেরা এগুলোকে কুসংস্কার ও বুজরুকি বলে চিহ্নিত করলেও এতদ্ঞ্চলের সাধারণ নিরীহ মানুষেরা দেবাংশীর আদেশ-নির্দেশকে পাথেয় করে জীবন অতিবাহিত করেন। তাই দেখা যায়, দেবাংশী এ সাংবাদিককে নিজে বাধ্য হয়ে বলেছেন যে, আমার কাজগুলি গ্রামের মানুষের বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছে। এই কথা বলে দেবাংশী সুখন মণ্ডলের বোবা কালা ছেলেকে মা বিষহরির থানের ফুল ও মাটি তাবিজ করে ছেলের গলায় পড়ানো বিধান দেয়। এবং আরও বলে যে, বিষহরির কৃপা হলে হয়তো ছেলেটার মুখে কথা ফুটবে অথবা ফুটবে না। এতে সাংবাদিকের অবিশ্বাস বলে দেবাংশী তাকে প্রশ্ন করেন— ডাক্তার দেখালে সব মানুষ কি ভালো হয়? এই বলে তিনি সাংবাদিকের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের শহরাঞ্চলে ডাক্তার, বদ্যি, উকিল, মোক্তার, মরুব্বি এবং এম.এল.এ সব আছে। আপনারা বিপদে পড়লে তাদের কাছে যান এবং সব সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু গ্রামের মানুষের কাছে মা বিষহরি, চামুণ্ডা, কালী এইসব দেবীরাই হলেন তাদের নিদারুণ অভাব, দৈন্যদশা ও জরা-ব্যধি থেকে পরিত্রাণের উপায়।

এরপর দেবাংশী গ্রামের সাধারণ মানুষদের বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে নিদান দিতে গিয়ে ঘণীভূত হয়ে চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে। ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে ..... জানা যায়, গ্রামের সাধারণ কৃষক সেতু বর্মন তার মেয়ের বিয়ের সময় ছ বিঘা জমির ফেরত কবলা বাবদ ছশ টাকা ধার নিয়ে গরীব সেতু বর্মন সে ধারের টাকা শোধ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু জোতদার দেবেন মণ্ডল ফেরত কবলা ফেরত দিতে চায় না। বরং সে সেতুর জমি খাস দখলে ভোগ করতে চায়। এই ঘটনায় ভেঙ্গে পড়ে সেতু

দেবাংশীর কাছে নিদান চায়। তখন দেবাংশী বাধ্য হয়ে স্ত্রী মোক্ষদার কাছে বলেছে— ''দেবতার কোপ মানুষের উপর পড়ে। মানুষ দিশা হারায়। ফির দেবতার কাছে আর্জি জানায়। দেবতা কিরপা কইরলে ভাল, নাতে মানুষের কেছুই কইরবার নাই। দেবতার সাথে বিবাদ কইবার ক্ষমতা মানুষের নাই। কিন্তুক মাইনষের কোপ যদি আর এটা মাইনষের উপর পড়ে আর এ কোপ যাওয়া মানুষটা যদি দেবতার কাছে আর্জি জানায়, বিচার চায় তখন দেবাংশী কি কইরবে? কি করা কর্তব্য তার?" (পৃ. ১৭) একথা বলার পর দেবাংশী মনের দুঃখে আরও বলেছেন— ''জোতদারের ফেরৎ কবলার নিস্পত্তি মুই ক্যামকা করে করমো।" (পৃ. ১৭)

এরপর বাধ্য হয়ে দেবাংশী সেতু বর্মনকে আদেশ করে মায়ের থানের মাটি গলায় তাবিজ করে পড়তে বলে মণ্ডল উচ্ছেদ করতে চাইলে মা বিষহরির নামে তাকে বাধা নিতে বিধান দেয়। দেবাংশীর এই কথায় সেতু খুশি হয়ে জয় মা বিষহরির নামে জয় দিয়ে সে মনে শক্তি ফিরে পায় এই আশায় যে, মণ্ডল আর জমির কবলা ফিরে নিতে পারবে না। এই ঘটনার পরিণতিতে দেখা যায় দেবেন মণ্ডল দেবাংশীকে শাসানি গর্জন করেছে এবং কিছু দিন পরেই তার সাপের দংশনে কৃত্যু হয়। এতে গ্রামের সকল মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, দেবাংশী অপমান করার জন্য মা বিষহরির অভিশাপের কোপে দেবেন মণ্ডলের মৃত্যু হয়। তারপর রুহিনী সরকারের ভাগচাষী জাফর রুহিনী সরকারের ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে ভাগচাষের জমির দখলের আর্জি দেবাংশীর কাছে জানায়। এবং দেবাংশী রুহিনী সরকারকে বলেছেন যে, মায়ের কাছ থেকে স্বপ্নে আদেশ পেয়েছেন জাফরকে জমির দখল দিতে হবে। এই কথায় রুহিনী সরকার জাফরের নামে জমির অংশ তাকে ফেরৎ দেয় এবং দেবাংশীর কাছে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয়। কিন্তু দেবাংশী গ্রামের মানুষদের বিষয়-সম্পত্তির বিধান দিতে দিতে অতিষ্ঠ হয়ে বলে— ''মোক রেহাই দে মাও বিষহরি— মোক রেহাই দে।" গ্রামের জোতদার ধনীবানদের বিরুদ্ধে চলতে চলতে শেষপর্যন্ত দেবাংশীকে দেবেন মণ্ডলের ছোট ছেলে বিনোদ অপমান অপদস্ত করে নাকে ঘুষি রমেরে বলে— ''শালা ক্ষেতমজুর চাষী বর্গাদার সবাইকে তাতাচ্ছ দেবতার ভড়ং নিয়ে।"(পৃ. ৪৯) শুধু এখানেই থেমে না থেকে বিনোদ তাদের ভাগচাষী সেতু বর্মনকে শাসিয়েছে এই বলে যে, বাবার কাছ থেকে তুমি ছ'শ টাকা হাওলাত নিয়েছিলে কিন্তু পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে তাই তোমাকে বারশ টাকা এখনই দিতে হবে বলে জোর জুলুম করে। কিন্তু সেতু তার উত্তরে জানায় আমি ধান উঠলে বারশো নয় আটশ টাকা দেব। এই ঘটনার পর বিনোদ সেতুর মেয়ে সুশীলার ইজ্জত হরণ করলে সুশীলা দেবাংশীর কাছে আর্জি জানিয়ে বিচার চায়। দেবাংশী তখন বাধ্য হয়ে হাত জোড় করে সে বিচারের ভার গ্রামের সাধারণ জনতার উপর ছেড়ে দিয়ে নিজের অন্তরের ক্ষোভের কথা ব্যক্ত করেছে— ''আইজ মোর

কথা কবার দিন আসছে। মোর কথা আপনাহরের শুইনবা হোবে। এই তিরিশ বছর ধইরে দেবতার জ্ঞানে আপনেরা হামাক ভক্তি করিছেন। পূজা দিছেন— মুই সিলা নিছি। মুই মহাপাপ করিছি। সি পূজায় মোর অধিকার নাই মুই তাই নিছি। মোক ক্ষমা করিছেন আপনোরা সব। মোর কথা শোনেন সব, মুই সারবান লোহার, মোর বাপের নাম হীরামন লোহার। আপনোহারে দশজনের মতই মুই একটা মানুষ, এটা হালুয়া চাষি।" দেবাংশীর এই কথায় থেকে এটা পরিষ্কার যে, সে দেবতা নয়, মানুষ। মোটকথা দেবত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উত্তরণের বিষয়টি এই নাটকের কেন্দ্রীয় বা মূল চরিত্র দেবাংশীর মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয়ে উঠেছে।

দেবেন মণ্ডল:

'দেবাংশী' নাটকের একটি অন্যতম চরিত্র হল দেবেন মণ্ডল। দেবেন জোতদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষ— গ্রামীণ সমাজের কৃষিজীবি মানুষদের নানারকম ভাবে শোষণ করে। যার জমি যত বেশি তার উৎপাদিত ফসলও তত বেশি এবং সে ধনবান এই চিরাচরিত ধারণা গ্রামে এখনও বর্তমান। ধনবান দেবেন মণ্ডলের বাড়িতে অনুমোদন প্রাপ্ত বন্দুক আছে। সেতু বর্মন তার মেয়ের বিয়ের জন্য ছ'বিঘা জমি ফেরত কবলা বাদে ছ'শ টাকা ধার নিয়েছিল। বর্তমানে দেবেন মণ্ডল টাকার পরিবর্তে সেতুর জমির দখল নিতে চায় কিন্তু সেতু বর্মন সেই ধারের টাকা পরিশোধ করতে চায়। গরীব চাষীরা সরকারী মামলা-মোকদ্দমা করতে পারে না তাই তারা গ্রামের বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান খোঁজে। 'দেবাংশী' নাটকে সরবান ছিল তাদের শেষ আশা-ভরসা এবং গ্রামের বিশহরি থানের বিচারক। সারবানকে গ্রামের মোড়ল দেবেন মণ্ডলের আক্রেশের শিকার হতে হয়েছিল সাধারণ ভাগচাষী সেতুকে রক্ষা করতে গিয়ে— ''এলা কি শুরু করিচি লোহার?" দেবেন নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট— ''শুন হে সারবান লোহার তুমার এলা বোল চাল শানার সময় আমার নাই। আর তোমার ঐ দেবাংশীর ছোটমোর উপর না দেখান। দেবাংশী আছ দেবাংশী থাক মুই কাকও কিছু কমনা। কিন্তু পরের বিষয় সম্পত্তির বেপারে বেশি মাথা ঝুকালে তোমার ঐ মাথা মুই নামাই দিম সি খিয়াল থাকে যেন।" নাটকে দেবেন মণ্ডল একটি প্রতিনায়ক চরিত্র। সে সারবানকে গ্রামের সকলের মতো দেবাংশী মানে না— ''আ মুই ভুলেই গেইছিনু তুই হলেন দেবাংশী। ঠিক আছে। এই গিদনা কিছু নাগবে না। বেবাক মানুষ তোমাক দেবাংশী কলেও আমি তোমাক মানুষই ভাবি।" নাটকের মধ্যে দেবেনের দৃঢ় মানবিকত্ব ও দেবাংশীর দেবত্ব এই দুই এর মধ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিঘাত ঘটেছে। শেষস্তরে অবশ্য দৈবের কৃপায় সাপের দংশনে দেবেন মণ্ডল নিহত হয়। সারবানের সাথে দেবেন মণ্ডলের অমানবিক দুর্ব্যবহারের ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে গ্রামের মানুষের দেবাংশীর প্রতি বিশ্বাস আরও গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। দেবাংশীর প্রতি সকলের

এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ও আবার ষড়যন্ত্র হয়েছে দেবেনের ছেলে বিনোদের দ্বারা।

সেতুবর্মন:

'দেবাংশী' নাটকে একটি অত্যন্ত সহজ সরল, অশিক্ষিত গ্রামের ভাগচাষী, কৃষক চরিত্র সেতু বর্মন। জোতদার দেবেন মণ্ডল গ্রামের কৃষিজীবি মানুষদের নানাভাবে শোষণ চালায় এবং সেতু বর্মনও তার এই অত্যাচারের শিকার। মেয়ের বিয়ের সময় সেতু ৮০০টাকা ধার নিয়েছিল ছ'বিঘা জমির ফেরত কবলা দিয়ে। কিন্তু নাটকের প্রতিনায়ক চরিত্র দেবেন মণ্ডল আর টাকা চায়না, তার পরিবর্তে জমি দখল করতে চায়। তাই সে অসহায় অবস্থায় এসেছে সারবানের বিশরি থানে বিচার চাইতে— ''মাও। মুই বিচার চাও। গরীবের প্যাটত হাত দিছে দেবেন মণ্ডল। তিন বছর আগে মিয়া বিয়ার সম মণ্ডলের কাছে ছ'বিঘা জমিন ফেরত কবলা করে ছ'শ টাকা ধার নিছল। এখন মুই ধার সুধবা চাই, কিন্তু মণ্ডল ফেরৎ কবলা ফেরৎ দিবার চাহেনা তুমি বিচার করেন মাও। মোক কয়া দেন মাও মুই এখন কি করমো।''

সেতু সহজ সরল, সংস্কার-বিশ্বাসী, অশিক্ষিত। ঘর-সংসার, ছেলেপুলে যেমন সেতুর জীবনের একমাত্র ধন, তেমনি অপরদিকে গ্রাম্যদেবতা, দেবতার পূজারী, প্রচলিত বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠিত দেবাংশীও তার ধন। নাটকের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দারিদ্র্যের শত নোংরা আবর্জনা, ছেঁড়া ময়লার মধ্যেও সে নিজেকে ধরে রেখেছে সংসারের স্নেহ প্রীতির বাঁধনের মধ্যে। সাধারণ ভাগচাষী সেতুকে রক্ষা করতে গিয়ে দেবাংশীকে গ্রামের মোড়ল দেবেন মণ্ডলের আক্রোশের শিকার হতে হয়েছিল। নাটকের পরিণতিতে সাপের দংশনে দেবেন মণ্ডল নিহন হলেও সেতু বর্মন তার ঘর সংসারকে রক্ষা করতে পারেনি। প্রতিনায়ক বিনোদের সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ওঠে সে। সেতু বর্মনের সঙ্গে বিনোদের সংঘাত বাঁধে ''সারবান লোহার তোমাক মোর বাপের হাত থিকা বাঁচাইছিল কিন্তু মোর হাতত সে বাঁচবা না। ঐ শালা লোহার ইবার তোমাক ক্যামকা কইরে বাঁচায় সেটা মুই দেখম।'' সেতুও প্রতিবাদের সাহস লাভ করেছিল সারবানের প্রতি অবিচল ভক্তি নিষ্ঠা থেকে। সেতু বিনোদের মুখের উপর বলে ওঠে— ''বিনোদবাবু, সারবান লোহার মানুষ নয় দেবাংশী, আমাহরের দেবতা, তার নামে আর একটা বাজে কথা কইলে তোমার মাথা মুই দু'ফাক কইরে দিম। যাও বাড়ি যাও। বাড়াও আমার বাড়ির থে।'' একদিকে প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে আঘাত, নিজের দেবতার আপমানে ক্রুদ্ধ— অপরদিকে নীতিহীনা, অর্থের দম্ভে স্বৈরাচারিতা— এই দুই-এর সংঘর্ষ দেখা যায় সেতু চরিত্রটির মধ্যে। বিনোদ— 'তোমার ঐ দেবাংশীর মুখে মুই মূর্তি'' বলায় সেতু গর্জে উঠে— ''হে বিনোদবাবু' বলে মারমুখী হয়ে ওঠে।

যশোদা:

দক্ষিণ দিনাজপুরের স্বনামধন্য ও খ্যাতনামা নট-নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় রচিত 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমা সংলগ্ন বাঁপুড়ে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তেভাগা আন্দোলন জোড়ালো ভাবে সুসংগঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলার বর্গাদার কৃষকদের (share eropen) উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ আধিয়ারদের ভাগে এবং ১/২ অংশ জোতদারদের ভাগে— এই দাবি পূরণের লক্ষ্যে 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে জেলার ভূমিজ সন্তানদের বাঁচার তাগিদে সোচ্চারিত হয়ে প্রতিবাদে কণ্ঠে আন্দোলনে সমবেত ভাবে ঝাপিয়ে পড়েছিল মূলত এ নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র যশোদার নেতৃত্বে। সাধারণ কৃষক ঘরের গৃহবধূ যশোদা বর্মন জনৈক সামসেরের আড়ালে থেকে জেলার সমস্ত ভাগচাষী আধিয়ার কৃষকদের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তাদের সুসংগঠিত করে তেভাগা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। এমনকি দেখা যায় যশোদা এখানেই শুধুমাত্র থেমে না থেকে এই তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষকেও যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধি সততা ত্যাগ ও পারস্পরিক সহবস্থানের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে বেঁচে ও বেড়ে ওঠার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তুলে তাদেরকেও যুক্ত করিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত এই তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব স্থানীয়া অসাধারণ বীর ও সিংহীর ন্যায় দক্ষ দাপুটে স্বভাবসিদ্ধা যশোদার সঙ্গে গ্রামের ক্ষমতার মূলকেন্দ্রের কাণ্ডারী জোতদার রজব আলী ও মুখুটি মহাশয়ের বিরোধ চরমে ওঠে। এমনকি এই জোতদারেরা ইংরেজ তোষণের সূত্র ধরে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে জেলার তেভাগা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ তেভাগার দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তি দারোগা সাহেবকে রীতিমতো উপঢৌকন ও পরিপোষণের দ্বারা তৃপ্ত করে আন্দোলন রত কৃষকদের ও তাদের মাথা যশোদার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি ও জেলে বন্দী করে শায়েস্তা করার জন্য তারা লেলিহান হয়ে ওঠে। জোতদারদের এই বিরুদ্ধাচারণের আচরণকে তোয়াক্কা না করে যশোদা গ্রামের সকল ভাগচাষী ও আধিয়ার কৃষকদের সুকৌশলে তেভাগার দাবির পরিপূরণের জন্য ক্রমশ ঐক্যতা ও সংহবদ্ধ করে তোলে। অপরদিকে দারোগা সাহেব জোতদারদের ও আই বি মাখনের কথা- মতো যশোদাকে সামসের সন্দেহ করে ভীষণ ভাবে শাসন, হুমকি, জিজ্ঞাসাবাদ, ঘরে তল্লাশী, ৫ বার চৌকিত ধরে নিয়ে যাওয়া ও ৩বার দুদিন আটক করে রেখেছেন তবুও সামসেরের কোন সঠিক সন্ধান পাননি। তাই তিনি যশোদা বর্মন সম্বন্ধে জোতদার মুখুটির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বাধ্য হয়ে বলেছেন— ''বেশ, মেনে নিলাম, চেনে। কিন্তু যশোদা বর্মনের মুখ খোলাতে পেরেছেন? আমিও তো কত চেষ্টা করলাম। ইনটারোগেশন, হুমকি, মার, আটক। কিন্তু না, আসল কথার ধার দিয়েই যায় না। যতসব উল্টোপাল্টা কথা—

মেয়েছেলে তো নয়, যেন সিংহী।" (পৃ. ১২) এরপর যশোদা বর্মনের নির্দেশ মতো রসুল গ্রামের কৃষকদের বাঁচানোর তাগিদে তেভাগার স্বার্থে সিরাজুল, অমূল্য ও জগাকে নিয়ে পুলিশ চৌকিতে সিঁদ কেটে ছয়টি রাইফেল চুরি করে নিয়ে আসে। এবং যশোদা তার বাড়িতে গ্রামের মানুষদের দ্বারা পুলিশের বন্দুক নিয়েই দারোগা সাহেব। পুলিশের ৮০ মাখন। কেজন সেপাই, জোতদার রজব আলী ও মুখুটি মহাশয়কে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন ও অপর দিকে তার আদেশে গ্রামের ভাগচাষী কৃষকরা ভোর হওয়া মাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও উদ্যমতার সঙ্গে হাতে লাঠি, তীর-ধনুক, কাস্তে ও হাসুয়া নিয়ে তেভাগার ধান কাটার জন্য জমিতে নেমে পড়ে ফসল ঘরে তোলে। অপরদিকে দারোগা সাহেব তেভাগা আন্দোলন দমন করার জন্য মাখন বাবুকে ক্যাম্পে খবর পাঠানোর আদেশ করেছেন। আবার কখনো বৃথা গর্জন করেছেন। পরিশেষে দেখা যায় দারোগা সাহেব, জোতদার রজব আলী ও মুখুটি মহাশয় যশোদার অধীনে বন্দী হয়ে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

রসুল:

'মন্ত্রশক্তি' নাটকে অত্যন্ত অসহায় গরীব জনমজুর গৃহকর্তা রসুল আলী ভীষণ পরিশ্রম ও ফায়ক্লেশের স্ত্রী আমিনা ও একমাত্র সন্তান রসিদকে নিয়ে অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে। অভাবের তাড়নায় ক্লিষ্ট, দীনদুঃখী রসুল গ্রামের জোতদার মুখুটির বাড়িতে দিন মজুরীর কাজ করে কিন্তু সঠিক সময়ে মজুরী সে পায় না। তাই অভাবের যন্ত্রণায় দীর্ণ রসুল কখনো কখনো কোন উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়ে অন্য ধান্দা করে জীবন চালাতে হয়। অর্থাৎ সে গ্রামের ধনবান তথা সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়িতে রাতে সিঁদ কেটে চুরি করে বাঁচার খোরাক সংগ্রহ করে রসুল পরিবার নিয়ে কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করে। অপরদিকে গ্রামের ভাগচাষী কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের মধ্যে দুই ভাগ পাওয়ার জন্য তেভাগা আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্তভাবে যশোদার নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে রাতে রাতে সংগঠিত হয়ে মিটিং করে শাসক শক্তির বিরুদ্ধে। আর গ্রামের জোতদার মুখুটি, রজব আলী, মদনকুণ্ডু স্থানীয় প্রশাসনকে হাত করে তেভাগা প্রতিরোধ করার জন্য সবরকম পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এর ফলে গ্রামের সকল অসহায় ও গরীব মানুষের মধ্যে এই আন্দোলনের প্রভাব সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই লক্ষ করা যায়, গ্রামের জোতদারদের এই ষড়যন্ত্র মূলক ভাগচাষ কৃষকদের শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ দিনমজুর রসুলও আন্দোলিত ও উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। সে কারণে রসুল রহমতকে কথা প্রসঙ্গে বলেছে পোদ্দার যেমন আমাদের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে খাচ্ছে অন্যদিকে চাষীগুলানকে নেইংটা করছে রজব আলী যার মুখুটি। মোটকথা বর্গাদারেরা তেভাগার জন্য যে আওয়াজ তুলেছে সেটাকে যে অন্তর থেকে ন্যায় বলে মেনে নিয়েছিল অর্থাৎ সে তেভাগার দলত না থাকলেও তেভাগা হোক এটা যে চেয়েছিল। এরপর রসুল হাতেমের

কাছে থেকে জানতে পারে যে, সামসের তাকে যশোদাদির বাড়িতে যেতে বলেছে। তাই সে যশোদার বাড়িতে গিয়ে যশোদার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যদিয়ে সে অবগত হয় যে, তেভাগার উদ্দেশ্য সার্থক করার লক্ষে ভাগচাষী কৃষকদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তাকে রজব আলীর কাছারি বাড়ির পুলিশ চৌকি থেকে দু'খান বন্দুক চুরি করতে হবে। এতে রসুল রাজি না হলে যশোদা তাকে বলে যে, কাজটা করতে পারলে গ্রামের সব মানুষ তোর চোর বদনাম ঘুচিয়ে মাথায় করে রাখবে। এই কথা বলার পর যশোদা রসুলকে উদ্বুদ্ধ করে এই বলে যে। এতদিন চুরি করিছিস নিজের জন্যে। আজ চুরি করতে যাচ্ছিস গ্রামের সব মানুষের জন্য, এতে কোন পাপ নেই। যশোদাদির এই কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে রসুল তার স্ত্রীকে বলেছে— ''এ্যাদ্দিন নিজের প্যাটের তংকে চুরি করিছি, অনেক পাপ জমিছে। আইজ সি পাপের জোরে মুই পুণ্য কিনমো। দি মন্তরটা একবার পড়ি দে।'' রসুলের এই কথায় স্ত্রী আমিনা রাজী না হওয়ায় তার স্ত্রী আমিনাকে বোঝায় ''ইবার নিজের জন্য নয় ব্যাবাক মাইনষের তংকে চুরি কইরমো।'' এতে আমিনা রাজী না হলেও রসুল জোরপূর্বক স্ত্রীকে বুঝিয়ে গ্রামের সব কৃষকদের তেভাগার লক্ষ্যে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে সিরাজুল, অমূল্য ও জগাকে নিয়ে চড়ক ডাঙ্গা, ভাতিন্দা ও নিশাপুর এই তিন গ্রামকে লক্ষ করে জোতদার রজব আলীর কাছারী বাড়িতে অবস্থিত পুলিশ চৌকি থেকে সিঁদ কেটে ছয়টি রাইফেল চুরি করে। তার এই কাজে খুশি হয়ে যশোদা রসুলকে বলে তুমি দেবতা রসুল, তোমরা সবাই দেবতাকে প্রণাম কর। এবং রসুলকে উৎসাহিত করে যশোদা আরও বলেছে ''আইজ তুই যিখানে উঠিছিস, সিখানে ই গাঁওর কেউ পৌঁছবা পাইরবে না।'' মোটকথা, রসুল গ্রামের ভাগচাষী আধিয়ার কৃষকদের তেভাগার দাবি পূরণের জন্য যে মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছে তার মধ্য দিয়ে সে শাসকের বিরুদ্ধে চিরন্তন প্রতিবাদী চরিত্রের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছে।

রজব আলি:

সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে দিনাজপুরের 'খাপুর' এলাকায় সে সংঘবদ্ধ সংগঠিত কৃষক আন্দোলন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল, তারই পটভূমিকায় 'মন্ত্রশক্তি' নাটকটি রচিত। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে জমিদার বিত্তবানের দল এই গণআন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে মারমুখী হয়েছিল। রজব আলি ছিলেন তাদের মধ্যে একজন জমিদার যিনি সবসময় এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। রজ আলি পুলিশ প্রশাসনকে নিজের হাতে রেখেছিলেন তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। সেই জন্যই তিনি বাড়িতে দারোগাবাবুর জন্য ভুড়ি ভোজের আয়োজন করেছিলেন। এটি ছিল আসলে জমিদার ও দারোগা শ্রেণীর বৈঠক। রজব আলি সর্বদা নিজের স্বার্থ

নিয়েই ব্যস্ত, বর্গাদার শ্রেণীর লোকের কথা সে কখনো ভাবেনি। তাই সে বর্গাদারদের নানাভাবে প্রলভন দেখিয়েছে— ''বর্গাদারগুলান ডাইকলে আসে না। ওদের বাড়ি বাড়ি যায়ে বুঝাইছি তেভাগা কইরলে বীজধান, হাল, লাঙ্গল, বদল এলা পাবু না। বিপদ-আপদ, ধার-বাকি, দিন-মজুরি বেবাক বন্দ হোবে। কি কমো ছাড়, খালি কথা শুনা... যায়-এটা কথাও কয়না। পরম পরম শুনতো, এখন আমাহরের দেইখলেই তিন ঘাটা ধরে। বাড়িত যায়ে পাওয়া যায়না শালাদের। সব সামসেরের চ্যালা হচ্ছে।'' রজব আলি চরিত্রটি প্রশাসনিক পক্ষ নিয়ে চরিত্র ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যদিকে সামাজিক শক্তির পক্ষ গ্রহণ করেছে যশোদা বর্মন, রসুল প্রভৃতি। সুতরাং নাটকটির মধ্যে স্পষ্টতই দুটি বিপরীত মেরুর প্রতিবাদ প্রতিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। নাটকটিতে রজব আলিকে একটি অত্যন্ত লোভী চরিত্র হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। দারোগাবাবু জমিদারদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন তেভাগা হলে সরকারকে যাজনা কমানোর আবেদন এর জন্য। কিন্তু রজব আলি জানিয়েছেন— 'হ্যাঁ ছাড়, এক ভাগ পায়ে এত খাজনা কেমন করে দেয়া যাবে, কন?'' নাটকের শেষ স্তরে তেভাগা আন্দোলনের প্রধান নেতৃ যশোদার বাড়িতে দারোগাসহ জোতদার রজব আলি, সংগঠিত বর্গদার কৃষকদের দ্বারা বন্দী হয়ে পরাজিত হয়েছিল এবং জয়ের মালা বরণ করেছিল। কেন্দ্রীয় চরিত্র যশোদা বর্মনের নেতৃত্বে ভাগচাষীগণ। তাই রজব আলি বাধ্য হয়ে যশোদার কাছে বিনীতভাবে জানিয়েছিল— ''যশোদা আমাহরে ছাইড়ে দাও নাতে ভুল কইরবা। আমার বাড়িত দুটা বন্দুক আছে... সিটা চালাবার লোকও আছে।'' ...''তারইতো কছি, ছাইড়ে দাও।''

পানু :

'যতীনবাবুর চাকর' নাটকে পানু চরিত্রটি গ্রামের অতি সাধারণ পরিবারের একটি প্রতিবাদী যুবক চরিত্র। সমাজ ব্যবস্থায় জোতদারদের বিভিন্নভাবে শোষণ অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ণ কোনভাবেই মেনে নেয়নি। বরং তার বিরুসদ্ধ সক্রিয় থেকে বাঁধা দিয়ে প্রতিবাদ মুখর চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। দারিদ্রের শত ময়লা, নোংরা আবর্জনার মধ্যেও সে নিজেকে ধরে রেখেছে সমাজে। দারিদ্র-পীড়িত মানুষের মানসিকতার সঙ্গে পানুর জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয়। আলোচ্য নাটকটিতে সামন্ততান্ত্রিক জোতদার যতীন পক্ষ এবং এর প্রতিপক্ষ ভূমিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পানু চরিত্রটি। সামন্তপ্রভুদের প্রভাব প্রতিপত্তির দাপটে অতি সাধারণ নিরীহ মানুষ পানুর জীবন করুণবিদারক হয়ে উঠেছিল। যতীন ছিল নির্যাতিত মানুষের প্রতিনিধি। পানু যতীন মণ্ডলের বাড়িতে দিন মজুরের কাজ করত। এরপর জমিদারের বাড়িতে দাক্ষীর সাথে পানুর ভাব বিনিময় হয়। দাক্ষী বলে— ''নাই আসিম— কাছোত আসিলে বাশী বন্ধ হয়ে যায়— দুরতেই থাকিস।''

পানু যথেষ্ট পরিশ্রম করলেও সে যাতায়াত মজুরি পেত না। জমিদারের ম্যানেজার সত্যবাবু

তাকে মজুরি বরাবর প্রতিশ্রুতি দিত কিন্তু কোন কাজ হত না। পানু সত্যনারায়ণকে বলেছিল— ''তোমরা একটা কি করি দাও,'' পানু যথেষ্ট ভালো বাঁশি বাজাতে পারত, যতীনবাবুর বাড়িতে পূজায় সে বাঁশি বাজিয়েছিল। জমিদারবাড়িতে কাজে আসার আগে সে এক যাত্রাদলেও কাজ করত। উপেন বলেছে— ''চিনিম নাই—তুই কপিল মণ্ডলের দলত ঢের দিন ছিলু— হেতেনা কি করেছিস্?'' পানু তার বাপের হঠাৎ মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বাড়িতে গিয়েছিল, কিন্তু তার দাদা শান্তি ও কানুর মনে সন্দেহ হয় যে সে হয়তো জমির ভাগ নেবার জন্য এসেছে। তাই তাকে বাড়িতে উঠতে দেয়নি। পানু অসহায় হয়ে আবার জমিদারের বাড়িতেই ফিরে আসে কাজের সন্ধানে। যতীনবাবু বাগঢোলে সরকারী প্রকল্পের জন্য মনোনীত জমি দখলের উদ্দেশ্যে চড়া দামে নতুন লাঠিয়াল দীনুকে নিয়োগ করেছিল পানুদের পৈতৃক সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পানু যতীনমণ্ডল তার দীনুর ষড়যন্ত্র শুনে ফেলে। এখানেই চরিত্রটি জীবন্ত নাট্যরূপ গ্রহণ করে। পানু আর দীনুর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে এবং দীনু মারা যায়। এই ঘটনায় পানু আর জোতদারের অধীনে থাকতে চায় না। সে মুক্ত হয়ে নিজের বাসস্থানে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে যতীন বাবুর সুকৌশলে তাকে আটকানোর চেষ্টা করলে সে তার প্রতিবাদী মনভাবের পরিচয় ব্যক্ত করেছে এইভাবে— ''চাকর হুই আর মুই থাকবা চাহুনা— চাকর হয়া থাকিলে নিজক চেনায় যায় না।'' জমিদারের নতুন ফন্দীর শিকার হয়ে পানুর কারাবাস হয়। নাটকের শেষ পর্বে পানু সামাজিক মর্যাদার সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল। এভাবেই পানু চরিত্রটি নাটকের Key character এ পরিণত হয়। সমাজ তাকে নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছে।

যতীন মণ্ডল:

'যতীন বাবুর চাকর' নাটকে যতীন বাবু একজন গ্রামের জোতদার যতীনবাবু তার প্রভাব প্রতিপত্তির দাপটে অতি সাধারণ নিরীহ মানুষদের উপর কিভাবে নির্যাতন, শোষণ চালিয়েছেন তার করুণ বিদারক চিত্র ফুটে উঠেছে নাটকে। অসহায় মানুষদের অভাবের সুযোগ নিয়ে তিনি নিজের মুনাফা লাভের চেষ্টায় সদা ব্যস্ত। তার এই শোষণের হাত থেকে পূণ্য, কেষ্ট, বলাই, ফটীক, পানু কেউই বাদ যায়নি। তিনি শ্রমিকদের শুধু কম পারিশ্রমিক দিয়েই কাজ করাতেন তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আহারের সংকুলানের মধ্য দিয়েও শাসক শ্রেণির শোষিতের প্রাপ্তি চিরকাল যে নির্যাতন করেন তার নজির বিহীন দৃষ্টান্ত এই চিত্রিত হয়েছে। এমনকি যতীনবাবু তার ম্যানেজার সত্যরামকে দিয়ে গ্রামের সাধারণ অসহায় নিরীহ মানুষদের সুদে টাকা দিয়ে মহাজনী কায়দায় শোষণ ক্রিয়া সক্রিয় বলে সে গ্রামের মানুষগুলোকে নিঃস্ব করে তুলেছেন। জোতদার যতীনবাবু শুধু শ্রমিকদের শ্রম শোষণ সুদখোর চক্রজালে অর্থলোভের পৈশাচিক বৃত্তি ছাড়াও আরও নানা উপায়ে তিনি গ্রামের সাধারণ মধ্যবিত্ত কৃষক ও অন্যান্যদের শোষণ করে থাকেন। নানা ধরনের আপদে বিপদে যতীনবাবু

আশ্রয় নিয়েছেন গুরুদেব কালিকানন্দ মহারাজের নিকট। যতীন ভাবে কিভাবে চললে তার প্রভাব বাড়বে এবং কে কে তার ক্ষতির কারণ এবং কাকে নিয়ে চলা উচিত— এইসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সমাধানের ইঙ্গিত দিতেন। নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য তিনি চড়াদরে একজন লাঠিয়াল রেখেছিলেন। সরকারী প্রকল্পের জন্য মননীত বাগঢোলের জমির দখল নেবার জন্য লাঠিয়াল দীনুকে নিয়োগ করেছিলেন পানুদের পূর্ব পুরুষের দু'বিঘা সম্পত্তির দখলের জন্য। এইভাবেই নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের জাল বুননের মাধ্যমে যতীন মণ্ডল চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে নাটকের শেষ স্তরে দেখা যায় দীনু লাঠিয়াল ক্রমশ চাপ সৃষ্টি করলেও পানু মাথা নত করেনি। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষে দীনু লাঠিয়াল মারা যায় এবং জয়ের মালা পানুই পড়েছিল। কিন্তু যতীনবাবু তার এই পরাজয়ের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পানুর কারাবাসের ব্যবস্থা করে। এর মধ্য দিয়ে জোতদার যতীন মণ্ডলের নিষ্ঠুর, নির্দয় ও কঠোর। হিংস্র শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রের রূপটি প্রতিপন্ন হয়ে ফুটে উঠে। যতীনবাবুর এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তার বক্তব্যে— ''দীনুটার তনে পানুটার সাহস বাড়ী গেইলে— শালার ডানা গাজিহাই— সৈত্য উয়াক শালা পিঞ্জরীত ভরবা হোবে।''

মোটকথা গ্রাম বাংলায় যতীনবাবুর মতো সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষদের মুখ শান্তি স্বপ্ন ও স্বাভাবিক জীবন যাপন মর্মবিদারক ও করুণ হয়ে উঠেছিল যা এই নাটকে যতীনবাবুর চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার সুস্পষ্ট রূপে বিধৃত করেছেন।

গোধূলী :

অশোক বান্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গোধূলী নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র 'গোধূলী'। শ্রীমতি (ছিরামতি) নদীর উপর সেতু তৈরির কাজকে কেন্দ্র করে সে অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের দিন মজুরির কাজের ফাঁকে তাদের অভাবজনিত দৈনন্দিন জীবনের একটি বাস্তবচিত্র গোধূলীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সে একজন সাধারণ গৃহবধূ-স্বামী হরোর শারীরিক অসুস্থতার কারণে ঔষুধ ক্রয় করা ছেলেকে পড়ানো ক্লিষ্ট হয়ে সংসারে অভাবের তাড়নায় সে বাধ্য হয় রেজিন খাটার জন্য। শ্রীমতী নদীর উপর ব্রীজ তৈরির কন্ট্রাকটরের অধীনে প্রচুর মরদ কুলিকামীন আর মিত্রিগুলোর সাথে কাজ করাটাকে তার স্বামী হরো কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। এমনকি হরো স্ত্রী গোধূলীকে 'ছিনাল' বা অসৎ চরিত্রের মেয়ে বলে ভর্ৎসনা করে। সে কারণে গোধূলী স্বামীর উপর অভিমান করে সে বাপের বাড়ি চলে যেতে চায় এবং পরিণতিতে দেখা যায় হরো একটু নিজেকে সামলে নিয়ে গোধূলীকে চলে যেতে বলে বারণ করে। এতে উভয়ের মধ্যে আবার পারস্পরিক প্রীতি ও ভালবাসার পরিবেশ গড়ে ওঠে। ঘটনাক্রমে স্বামী হরো অস্বাভাবিক জীবন যাপন বিশেষ করে মদ পান করে শারীরিক সংগঠন ভেঙ্গে ফেলে এবং কাজকর্ম কিছুই করতে পারে

না। এমত অবস্থায় হরো বিছানাগত হলে গোধূলী বিভ্রান্ত হয়ে কখনো গুণিত সদানন্দকে দেখিয়ে সুস্থ করার প্রয়াস করে আবার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসার মাধ্যমে হরোকে সুস্থ করে তোলার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে গৃহে অভাবের কঠোর ছোবলে সে বাধ্য হয় জমি বন্ধকি রেখে দুহাজার টাকা ঠিকাদার সুবল চৌধুরীর একান্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী নিখিল কর্মকারের কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। এবং তার স্বামীর অসুস্থতার সুবাদে শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়সহ অবস্থার সুযোগ নিয়ে উক্ত ঠিকাদারের অসৎ স্বভাবের কর্মচারী নিখিল তার মান ইজ্জতে লুণ্ঠিত করে। এইরূপ অবস্থায় গোধূলী নারী সুলভ আত্মমর্যাদার বলে বলীয়ান হয়ে প্রবলভাবে বাঁধা দেওয়ার সচেষ্ট প্রয়াস করে এবং সে বাধ্য হয়ে স্বামীর কাছে ফিরে এসে তার অন্তরে ব্যাথা বেদনা ও করুণ দুরবস্থার কথা পরিবেশন করে। তাই স্ত্রীসুলভ পবিত্রতা ও সতীর্থের মহিমায় এই চরিত্রটি উজ্জ্বল ও গুণমুগ্ধ একটি বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র রূপে প্রকটিত হয়েছে। তাই স্বামী হরো স্ত্রীর এই রূপ অপমান অমর্যাদায় স্ত্রীকে দায়ী না করে এই সমাজ ব্যবস্থার অনৈতিক ও অমানবিক শোষণ ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যারা মানুষের স্বাভাবিক জীবন, সুখ, স্বাচ্ছন্দ হরণ করে সেই নিখিল কর্মকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে ছেলে বিছানু ও গ্রামবাসীকে একত্রিত করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

মোটকথা গ্রামের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন অভাবে নিষ্পেসিত হতে হতে যখন আর কোন পথ থাকে না এমনকি সমাজের শোষণ ক্রিয়ার চক্রে চালিত হয়ে শেষ পর্যন্ত মনুষত্ব খোয়াতে বসে। এমন একটি মর্মবিদারক করুণ অবস্থার শিকার হয়ে এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোধূলী গোধূলীর মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

মুরারী:

'জলপোকা' নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র মুরারী। মুরারী একজন অত্যন্ত দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ। মুরারী তার পেশা নিয়ে অন্ত্যন্ত চিন্তিত। তাই সে তার মনোভাব ব্যক্ত করেছে এই বলে— 'নদীত জল ছিলো, এহন তো নদীক্ মানুষ নর্দমা বানাইছে।' মুরারী তার ছেলে বিশুকে নিয়েও যথেষ্ট চিন্তিত কারণ সে বেকার, কিছুই করে না আর বাবার পেশাকে নিজের পেশা হিসেবে নিতে চায় না। মুরারী সমাজে নানাভাবে অবহেলিত বঞ্চিত। MLA অনাথ ঘোষ ভোটের সময় মুরারীকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা বাস্তবে পূরণ হয়নি।

বৃদ্ধ মুরারী তার অভাবের যন্ত্রণায় ব্যথিত হয়ে এবং গ্রামের সকল জেলে মাঝিদের সম্প্রদায়গত পেশা বর্তমানে না থাকায় নানান পেশা গ্রহণ করে তারা জীবিকা নিবাহ করছে এবং তাদের সুখ স্বপ্ন ভবিষ্যৎ সব কিছুই যেন কোন একটি অদৃষ্টের বন্ধনে আবদ্ধ। সেই আবদ্ধ অবস্থা থেকে বেরোনোর জন্য কোন পথ নেই তাই মুরারী হতাশাগ্রস্থ হয়ে তার অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ

করে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে কখনো কখনো মানষিক দ্বন্দ্ব রসংঘাতে ভেঙ্গে পড়েছে। তার এই মনোভাব ব্যক্ত করে সে গ্রামের বিধানের উদ্দেশ্যে বলে— ''দেশের বাড়ির কথা মরণ কালেই শরণ হয়। সেই নদীভরা জল, মাছের অভাব নাই। কতদিন নদীর জলে নৌকা খাবার ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ নুনিয়া বিধান। র‍্যাতে সে কি, বড় মাছ জালে পইরলে। দে-বাড়ি প্যাইরা ফ্যালা। শুনবার পাও সি কাথা? জ্যালা পাড়ায় ঢুকলে এহন আর অ্যাঁইশটা গ্রন্ধ নাকে আসে না বিধান।''

পারিবারিক অভাবের তাড়নায় মুরারী ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অতিকষ্টে কায়ক্লেশে জীবনযাপন করে। সে আর আগের ন্যায় বার্ধ্যকের কারণে এবং আত্রেয়ী নদীর নাব্যতা হারিয়ে গিয়ে জলসঙ্কট প্রবলভাবে দেখা দেওয়ায় তার পরিবার কোন সুস্থ পেশা অবলম্বন করে স্বভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত হয়। তার একমাত্র অবলম্বন ছেলে বিশু উপার্জনে সক্ষম না হওয়ায় দারিদ্র্যের করুণ ছোবলে পিষ্ট হতে হতে তারমধ্যে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার কোন স্পৃহা আর নেই। এমনকি পুত্রবধূ কৌশল্যা অবৈধ জীবন যাপনে মুরারী কখনই মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। এইভাবে পারিবারিক ও সেই সঙ্গে সমাজের জেলে মাঝিদের দুরবস্থার বাস্তব অবস্থা লক্ষ করে সে নিজেকে আত্মহত্যাকে সম্পাদনের পথ হিসেবে বেছে নেয়।

তাই একদিন মুরারী নদী পারে বসে থাকে। সারাদিন নদীপারে থাকে, সন্ধ্যাতেও বাড়ি না ফেরায় কৌশল্যা খুঁজতে যায়। সে খুঁজে না পাওয়ায় সবাইকে ডাকাডাকি করে খুঁজতে শুরু করে। শেষে মুরারী নদীঘাটে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। একা সে নদীঘাটে জলপোকার মতো ভেসে থাকে মুরারীর মৃত্যুকে ঘিরে প্রতিবেশীদের বিভিন্ন আলোচনা (কৌশল্যার জন্য মুরারী মারা গেছে) শোনা যায়।

পরিশেষে একথা বলা যায় মুরারী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার এ জেলার প্রধান নদী আত্রেয়ীকে কেন্দ্র করে হালদার পাড়ার সাধারণ জেলে মাঝিদের সম্প্রদায়গত পেশা হারিয়ে তারা যে করুণ দারিদ্রের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার প্রয়াস করে চলেছে তার এক বাস্তব নিদর্শন বিধৃত হয়েছে।